দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...
SEP. 25 2002

পাঁচ লাখের মধ্যে চার লাখই ফেল, তাহলে কি শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা?

শিক্ষার্থীরা ফেল করছে, কিন্তু কেন করছে?

ফল বিপর্যয়ের ধারাবাহিকতায় পড়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পর পর তিনটি বছর একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ যাত্রা শুরু ১৯৯৬ সাল থেকে। সেবার পাসের হার ছিল ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ। আর এবছর ২৭ দশমিক ০৯ ভাগ। এ বছর দেশের সাতটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ৫ লাখ ৩৮ হাজার ২৯৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮১৮ জন। অর্থাৎ প্রায় ৫ লাখের মধ্যে প্রায় ৪ লাখই ফেল। জাতীয় সম্পদের এতো বড় অপব্যবহার এর আগে দেখেছে কি কেউ?

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সাল, দুটোর মধ্যে পাসের হারে সামান্য পরিসংখ্যানগত উন্নতি চোখে পড়লেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষার মান আগের চেয়ে অনেক নেমে গেছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের চেয়ে নোট বইয়ের উপর নির্ভর করে বেশি। একই সাথে বেড়েছে নকল নির্ভরতা, শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো হাজির না হওয়া ইত্যাদি। তবে আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে বলা যেতে পারে বাহ্যিক কারণ। মূল কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো পাঠদান না করানো, প্রাইভেট পড়ানোতে বেশি মনোযোগী হওয়া, সঠিক সময়ে সিলেবাস না শেষ হওয়া, টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় ফল বিপর্যয়টা ত্বরান্বিত হয়েছে। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, কাউখালী কলেজ, মানিকছড়ি কলেজ, সিজক কলেজ, নীলা কলেজের মতো কয়েকটি কলেজ থেকে পরীক্ষা দেয়া একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি শিক্ষা দেন আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা? আর কেনই বা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষার হলে পাঠান? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ব্যানবেইস' (বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিস্টিকস) থেকে প্রকাশিত ২০০১ সালের রিপোর্টে সরকারী এবং বেসরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা দেখা যায় প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৮২৬টি। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮১৮ জন। অর্থাৎ দেশের সর্বমোট আসন সংখ্যার চাইতে প্রায় ৪০ হাজার কম ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি করবে এখন? এই ফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে আমরা 'তরুণ কণ্ঠের' পক্ষ থেকে বেশ কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের এ মতামতগুলো এ ঘটনা অনুসন্ধানে সহায়তা করেছে। সরকারী বিজ্ঞান কলেজ থেকে এ বছরই পাস করেছে আমানুল ইসলাম। তিনি ফল বিপর্যয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী না করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু অসামঞ্জস্যতার কথা বললেন। প্রথমতঃ তাদের বেশিরভাগ শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে প্রস্তুতি নিয়ে আসে না। তাই তাদের পড়া ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে না। তাছাড়া বিজ্ঞান বইগুলো আকর্ষণহীনভাবে লেখা হয়েছে এবং যার সাথে দৈনন্দিন জীবনের তেমন কোন মিল খুঁজে পান না বলেও জানালেন। এছাড়া তাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিশাল একটি সিলেবাস পড়তে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনোই সিলেবাস শেষ করতে পারে না বলে, তাদেরকে বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়। ফলে মেধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসংগতির কারণে যারা প্রাইভেটের মাধ্যমে পড়াশোনার চর্চাটা রাখতে পারে না তাদের ফলাফল খারাপ হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা দেখা যায় প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৮২৬টি। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮১৮ জন। অর্থাৎ দেশের সর্বমোট আসন সংখ্যার চাইতে প্রায় ৪০ হাজার কম ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি করবে এখন?

বোর্ড	পরীক্ষার্থী	মোট পাস	পাসের হার
ঢাকা	১,৫৩,৯৫৯	৫৬,৩০১	৩৬.৫৭%
চট্টগ্রাম	৪৪,৪৫৬	৯,৯৩৪	২২.৩৫%
কুমিল্লা	৪৮,৫৩৪	৮,৩১৬	১৭.১৩%
সিলেট	১৫,২০৫	৪,৩৬২	২৮.৬৯%
রাজশাহী	১.৬৯,৯৯৯	২৯,৮১২	১৮.১৮%
যশোর	৭৪,৬৩৯	২৮,৬২৩	৩৮.৩৫%
বরিশাল	৩৭,৫০৩	৮,৪৭০	২২.৫৮%
মোট	৫,৩৮,২৯৫	১,৪৫,৮১৮	২৭.০৯%

আনুমানিক আসন সংখ্যা : ১ লাখ ৮২ হাজার ৮ শত ২৬।

আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এবার পাস করেছেন শর্মিষ্ঠা চৌধুরী। তিনি জানালেন বেশ কিছু শিক্ষক আছেন তাদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে তারা কলেজের ব্যবহারিক নাম্বার কম দেন। শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করার এটা এক ধরনের চাপ বলে তিনি জানান। হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ এ্যান্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী কাকলী আক্তারও ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে বেছে বেছে পড়ানোকে দায়ী করলেন। ফলে নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে থেকে কোন প্রশ্ন আসলে শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

❑ ফকরউদ্দীন আহমেদ জুয়েল

সরকারী কলেজগুলো নানা পরীক্ষার কারণে অনেকটা সময়ই বন্ধ থাকে, ফলে শিক্ষার্থীদের সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় না

– অধ্যাপক দিলারা হাফিজ, অধ্যক্ষ, ইডেন কলেজ, ঢাকা

পরীক্ষার এ ফল বিপর্যয়টাকে ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ দিলারা হাফিজ দেখছেন একটু অন্যভাবে। তার মতে, বেশিরভাগ সরকারী কলেজগুলো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, অনার্স পরীক্ষা, মাস্টার্স পরীক্ষা কিংবা অন্যান্য ছুটি ইত্যাদির কারণে বছরের তিনভাগের প্রায় দুইভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। ফলে এসব কলেজের শিক্ষকগণ সিলেবাস শেষ করার সুযোগ পান না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়ার মাধ্যমে সিলেবাস শেষ করতে হয়। এতে করে দিন দিন শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে এবং প্রাইভেটের মাধ্যমে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বেড়েছে।

এছাড়া তার মতে, এ বছর পাসের হার কম হওয়ার কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নকলের উপর নির্ভর করেছিল বেশি। কিন্তু তারা সে নকল করার সুযোগ পায়নি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এখন আর বইয়ের উপর অধিক নির্ভর করে না, নির্ভর করে নোট বইয়ের উপর এবং নকলের উপর। অন্যদিকে কিছু ছাত্র-ছাত্রীর অত্যধিক প্রাইভেট প্রীতিও একইভাবে তাদের পড়াশোনাকে বিঘ্নিত করে। এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ক্লাসে কমে যায় এবং পরীক্ষায় তাদের ফলাফল খারাপ হয়।

এটাকে আমি বিপর্যয় বলবো না, বলবো ভাল ছাত্র-ছাত্রীরাই পাস করেছে। ২/৩ বছরের মধ্যেই পাসের হার বাড়বে

– ডঃ সফিউর রহমান, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সফিউর রহমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের এ নিম্ন হারকে ফল বিপর্যয় বলতে রাজি নন। তিনি বলেন, এ বছর ছেলে-মেয়েরা নকল করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে শুধুমাত্র ভাল ছাত্র-ছাত্রীরাই পাস করেছে। অমেধাবীরা ঝরে পড়েছে। এ বছর নকল হয়েছে অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২/৩ বছরের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি ঘটবে। শিক্ষার্থীরা যখন দেখবে নকল করার সুযোগ নেই তখন বইমুখো হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের শিক্ষকদের নেই কোন জবাবদিহিতা, পাশাপাশি অভিভাবকদেরও নেই কোন সচেতনতা। শিক্ষকদের দায়িত্ব ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে পড়াটা আদায় করে নেয়া। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষকই তা করছেন না। অন্যদিকে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের কলেজে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ঠিকমতো ক্লাস করছে কি না, সে ব্যাপারে খোঁজ খবরও নেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীমুখী করার দায়িত্ব কোন শিক্ষকের একার নয়। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। এগুলোর পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও নকল বন্ধ করতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া অমেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ভারও কলেজগুলোকে বহন করতে হয়। এ ব্যবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এছাড়া শুধুমাত্র টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

ফল বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে জাতীয়ভাবে জাগরণ দরকার। সবার সম্মিলিত এবং সমন্বিত চেষ্টা করা দরকার

–ফাদার বেঞ্জামিন কস্টা, অধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন কস্টা প্রথমেই কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন "ছেলে-মেয়েরা নকল কেন করে?" এই প্রশ্নের। তিনি বলেন, এর মধ্যেই রয়েছে সব প্রশ্নের উত্তর। প্রথমত প্রাইমারি এবং হাইস্কুলে পড়াশোনার ভিত্তিটা শক্ত নয়। শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ানোতে ব্যস্ত। ফলে তারা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো শিক্ষাদান করতে পারছে না। দেশে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক প্রকার দৈন্যদশা চলছে।

ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা গেলে ছেলে-মেয়েরা আর নকল করবে না।

এজন্য পুলিশ, বিডিআর-এর প্রয়োজন নেই। নকল না করাটা ছেলে-মেয়েদের ভেতর থেকেই আসবে। এছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশে একটি নতুন জাগরণ দরকার এবং সবার সম্মিলিত এবং সমন্বিত চেষ্টা করা দরকার।